১৭ সংখ্যা ▌ নভেম্বর ▌ ২০১৫

ডায়াবেটিস নিউজলেটার

দাম ১০ টাকা

ডায়াবেটিস ও চোখের ছানি

অধ্যাপক এম নজরুল ইসলাম

চোখের লেন্স বা এর আবরণ (ক্যাপসুল) ঘোলা হয়ে যাওয়াকেই বলা হয় ছানি বা ক্যাটারাক্ট। আমাদের দেশে অন্ধত্বের অন্যতম প্রধান কারণ হচ্ছে, চোখের ছানি। ছানির প্রথম অবস্থায় লেন্সের কিছু অংশ ঘোলাটে হয় এবং খুব ধীরে ধীরে দৃষ্টির প্রখরতা কমতে থাকে। প্রাথমিক অবস্থায় চশমার পাওয়ার পরিবর্তন করলে দৃষ্টির প্রখরতা বাড়ানো সম্ভব। তবে ক্রমে ক্রমে লেন্স আরও ঘোলাটে হতে থাকে এবং ২/৩ বছরের মধ্যে প্রায় সম্পূর্ণ লেন্সই ঘোলা হয়ে যায়। সাধারণ মানুষ এ অবস্থাকে 'ছানি পাকা' বলে অভিহিত করেন। চিকিৎসা বিজ্ঞানের ভাষায় বলা হয়, ম্যাচিওর ক্যাটারাক্ট। সাধারণত ৬০ থেকে ৮০ বছর বয়সের মধ্যে এ ধরনের ছানি পড়তে দেখা যায়। অবশ্য বংশগত কারণে অনেকের এ বয়সের আগে বা পরেও ছানি পড়তে পারে। এই বয়সজনিত ছানিকে বলা হয় সেনাইল ক্যাটারাক্ট (senile cataract)। বয়সজনিত ছানি ছাড়াও ডায়াবেটিস, চোখের বিভিন্ন প্রদাহ ও অসুখে, গর্ভাবস্থায় মায়ের রুবেলা বা অন্য কোনো জীবাণুর প্রদাহ বা অসুস্থতার কারণে চোখে যে কোনো বয়সে ছানি পড়তে পারে।

ডায়াবেটিসের কারণে সন্দেহাতীতভাবে ছানি পড়ার ঝুঁকি খুব বেশি। 'ফ্রামিংহাম আই স্টাডি' নামের একটি গবেষণায় দেখানো হয়েছে যে, নন-ডায়াবেটিকের তুলনায় ডায়াবেটিক রোগীদের ৪০-৫০ বছর বয়স পর্যন্ত ছানি হবার হার কিছুটা বেশি। কিন্তু ৫০-৬০ বছরে এই হার ২-৩ গুণ বেশি। আবার ৬৯ বছর বয়সের পরে ডায়াবেটিক ও নন-ডায়াবেটিক রোগীদের ছানি হবার হার সমান সমান। এ গবেষণায় প্রমাণিত হয়েছে যে, ডায়াবেটিক রোগীদের বেলায় ৬৯ বছর বয়সের আগে পর্যন্ত বয়সজনিত ছানি তুলনামূলকভাবে দ্রুত শুরু হয় এবং তাদের চিকিৎসা বা ছানি অপারেশন তুলনামূলক কম বয়সে সম্পন্ন করতে হয়। তবে, অল্প বয়স্ক জুভেনাইল ডায়াবেটিক রোগীদের চোখেও একপ্রকার ছানি দেখা যায়, যা দেখতে সাদা ফোটা বা দাগের মত। স্লিট ল্যাম্প যন্ত্রের সাহায্যে এই ছানিকে তুষারকণার মত মনে হয় বলে একে স্নোফ্লেক ক্যাটারাক্টও (snowflake cataract) বলা হয়। পঞ্চম পৃষ্ঠায় দেখুন

স্বাস্থ্য খবর

হালকা ঘুমে চাঙ্গা মস্তিষ্ক

দীর্ঘ সময় কাজ করার পর একটু ঘুমিয়ে নিলে যেমন ক্লান্তি দূর হয়ে শরীর চাঙ্গা হয়ে ওঠে তেমনি এর ফলে মানুষের স্মৃতিশক্তি বা মস্তিষ্কের সামর্থ্যও বহুগুণ বাড়িয়ে তোলা সম্ভব। জার্মানির সারল্যান্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের একদল স্নায়ুবিজ্ঞানী এ কথা জানিয়েছেন।

নিউরোবায়োলজি অব লার্নিং অ্যান্ড মেমোরি সাময়িকীতে এ গবেষণা প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়েছে।

শীর্ষ গবেষক অ্যাঞ্জেল ম্যাকলিংগার বলেন, অফিসে কাজের বিরতিতে অল্প কিছু সময় (প্রায় ৪৫ মিনিট) ঘুম বা চোখ বন্ধ করে ঝিমিয়ে নিলে নতুন কিছু শেখার সামর্থ্য উল্লেখযোগ্য হারে বৃদ্ধি পেতে পারে। কারণ এ ধরনের বিশ্রামের ফলে মস্তিষ্কের হিপ্পোক্যাম্পাস নামের অংশের মাধ্যমে নিয়ন্ত্রিত স্মৃতির ওপর কিছু উপকারী প্রভাব পড়ে।

বিশ্ব ডায়াবেটিস দিবস
১৪ নভেম্বর

পড়ুন
ডায়াবেটিস নিউজলেটার

সুস্থ জীবনের জন্য স্বাস্থ্যকর খাবার

আখতারুন নাহার আলো

স্বাস্থ্য ভাল রাখার প্রথম শর্তই হচ্ছে সুষম খাবার গ্রহণ। এজন্য প্রতিদিনের খাবারে থাকতে হবে খাদ্যের ছয়টি উপাদান। যেমন- শর্করা, আমিষ, চর্বি, ভিটামিন ও খনিজ লবণ। বিভিন্ন ধরনের খাবারের সমন্বয়ে খাদ্য উপাদানের সঠিক অনুপাত ও চাহিদামতো ক্যালরির ফলেই স্বাস্থ্যসম্মত খাবার গ্রহণ করা সম্ভব। স্বাস্থ্যসম্মত আহারের উদ্দেশ্য এই যে, প্রতিদিনের খাবার গ্রহণের ব্যাপারটি যাতে আনন্দময় হয়ে ওঠে এবং দেহের প্রয়োজনীয় পুষ্টি উপাদান লাভ করে দেহের বর্ধন, ক্ষয়পূরণ ও কর্মক্ষমতাকে বাড়িয়ে দিয়ে সব দিকে ভাল থাকা যায়।

আবার অধিক পুষ্টিকর খাবার অধিক পরিমাণে খেয়ে ফেলাও একটা বিপজ্জনক ব্যাপার। কারণ এর ফলে হৃদরোগ, উচ্চরক্তচাপ, ডায়াবেটিসে, ওজনাধিক্যও ইত্যাদি অসুস্থতা দেখা দিতে পারে। খাদ্যাভ্যাসের ত্রুটির জন্যই আমরা বিভিন্ন ধরনের রোগে ভুগে থাকি। এজন্য খাবার গ্রহণের ক্ষেত্রে কয়েকটি পদক্ষেপ নিলে ভাল হয়।

অতিরিক্ত আহার পরিহার করুন

প্রয়োজনের বেশি খাবার আমাদের দেহে ক্যালরির যোগান দেবে বেশি। যা কোষের ভেতর জমা হয়ে চর্বিতে রূপান্তরিত হয়। এর ফলস্বরূপ দেখা যাবে ওজন বেশিসহ বিভিন্ন ধরনের স্বাস্থ্যঝুঁকি। এজন্য যা খাওয়া উচিত নয় সে ধরনের খাবার বেশি না খাওয়া। খেতে বসে বড় অংশটুকু নিজের পাতে তুলে না নেওয়া। প্রোগ্রামে না খাওয়া, পার্টিতে গিয়ে বিভিন্ন পদের খাবার বেশি না নেওয়া ইত্যাদি অভ্যাস করতে হবে।

আঁশযুক্ত যাবার খান

এটা খাদ্যের গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। যা আমরা হজম করতে পারি না। দেহের ওজন হ্রাসের জন্য আঁশযুক্ত খাবারের ওপর নির্ভর করা উচিত। এটি খেতে সময় বেশি লাগে বলে কম খেয়েও তৃপ্তি আসে। খাবারে অতিরিক্ত মাংস সুগার টলারেন্সকে কমিয়ে দেয়। অপরদিকে নিরামিষ খাবার কম উত্তেজক। এগুলো শোষিত হতে প্রচুর পানি প্রয়োজন হয় বলে কোষ্ঠ্যবদ্ধতা দূর হয়। বিভিন্ন ধরনের শাক-সবজি, ফল, লালফল, ভূষিযুক্ত আটার রুটি বা পাউরুটি ইষপগুলের ভূষি, ছোলা, ডাল, সিম ও বরবটি ইত্যাদি থেকে আমরা আঁশ পেয়ে থাকি। এগুলো কোষ্ঠকাঠিন্য। অর্শরোগ, কোলন ও রেকটাম ক্যান্সারকে প্রতিহত করতে সাহায্য করে। এছাড়া ডায়াবেটিস, কোলেস্টেরল ও ওজন কমানোর ক্ষেত্রেও আঁশের ভূমিকা রয়েছে। এতে প্রচুর ভিটামিন ও খনিজ লবণ রয়েছে।

অতিরিক্ত লবণ কেড়ে ফেলুন

বেশি লবণ স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর। এজন্য যতটা সম্ভব লবণ কম খাওয়া উচিত। কোন কোন খাবারে লবণ লুক্কায়িত অবস্থায় থাকে যা দৃশ্যত দেখা যায় না। যেমন- মাংস, সামুদ্রিক মাছ, ডিম, সয়াসস ইত্যাদি। আবার সংরক্ষিত খাবার ও বাণিজ্যিকভাবে তৈরি খাবারেও লবণ বেশি থাকে। যেমন- বারবিকিউ, স্মোক ফিস, আচার, পনীর, নোনা ইলিশ, নোনতা বিস্কুট, সুপ কিউব, পিকেলস, চিলিসস, চিপস ইত্যাদি। বাণিজ্যিক খাবারে লবণ সোডিয়াম হিসাবে থাকে। যেমন মনোসোডিয়াম গ্লুটামেট, সোডিয়াম বাই কার্বনেট, সোডিয়াম সাইট্রেট ইত্যাদি। অতএব সোডিয়াম শব্দটি থাকলেও সর্তক হয়ে যাওয়া উচিত। লবণের সঙ্গে যুক্ত অসুখগুলো হলো উচ্চ রক্তচাপ অসুখ। লবণের পরিবর্তে ব্যবহার করুন শুকনা মসলা, পিঁয়াজ, লেবুর রস, আদা ইত্যাদি।

সম্পৃক্ত চর্বি কম খান

এজন্য খেতে হবে কচি মাংস, মাছ, চামড়া ছাড়া হাঁস ও মুরগীর মাংসে, ননীবিহীন দুধ ও দই এবং উদ্ভিজ্জ তেল ইত্যাদি।

মাখন ঘি ডালডা দিয়ে খাবার রান্না না করে কর্ন তেল, সয়াবিন তেল, সূর্যমুখীর তেল, বাদাম তেল, রাইস ব্রান তেল, জলপাইয়ের তেল ব্যবহার করা যেতে পারে। এছাড়া সবচাইতে ভাল হয় খাবার না ভেজে ভাঁপিয়ে সিদ্ধ করে টেলে খাওয়া যেতে পারে।

কম চিনি খান

অধিক চিনি অবশ্যই বর্জনীয়। টিনজাত ফলের রস, কোমল পানীয়, গ্লুকোজের সরবত, মিষ্টি বিস্কুট, কেক, পেস্ট্রি চকলেট, আইসক্রিমের পরিবর্তে খেতে পারেন আস্ত ফল বা বাড়ির তৈরি ফরের রস, লেবুর সরবত, ডাব, চিনিছাড়া বিস্কুট, টোস্ট বিস্কুট ইত্যাদি। কম চিনি, কম মধু ও সিরাপ খাবারে ব্যবহার করা যেতে পারে। মেদবৃদ্ধি, ডায়াবেটিস ও দন্তক্ষয়ের জন্য মিষ্টান্নকে দায়ী করা হয়। এজন্যে মিষ্টি ও মিষ্টান্ন কম খেতে হবে। তৃষ্ণার্ত হলে শুধু মাত্র পানি পান করা যেতে পারে।

খাদ্য গ্রহণে পরিবর্তন আনুন

- দিনের শুরুতে ভারি প্রাতরাশ খেয়ে নিন।
- যে কোন প্রধান খাবারের পূর্বে সালাদ নিন।
- কখন ও কোন অজুহাতে বেশি খাবেন না। অথবা খিদে পাচ্ছে বলে বেশি খাবেন না।
- বার বার গরম করা তেলে খাবার রান্না করবেন না। এতে তেলের গুণ নষ্ট হয়ে যায়। (বাকি অংশ ৩য় পৃষ্ঠায়)

(২য় পৃষ্ঠার পর)

- রান্নার সময় ননস্টিক পাত্র ব্যবহার করুন। এতে তেল কম লাগবে।
- সবজি কেটে বেশিক্ষণ ফেলে রাখবেন না। এতে সবজির পুষ্টিগুণ নষ্ট হয়ে যায়।
- সারাদিনে অন্তত:একটি টক অথবা মিষ্টি ফল খান।
- প্রতিদিন পাঁচ ছয়বার খাওয়া স্বাস্থ্য কর।
- যদি হালকা নাস্তা খাওয়ার প্রয়োজন হয়, তাহলে খেতে হবে ফল ও কাঁচা সবজি যেমন- বিট, গাজর, ফুলকপি-বাঁধাকপি, মটরশুটি, মুলা সবজি স্যুপ ইত্যাদি।
- খাবার খেতে বসে সব সময় কম অংশটুকু খুঁজে নিতে হবে। যেমন ছোট প্লেট, খাবার কমিয়ে দেয়া, মাছ-মাংসের ছোট টুকরা ইত্যাদি।
- খাবার খাওয়ার পর যত তাড়াতাড়ি সম্ভব খাবারের টেবিল থেকে উঠে পড়তে হবে।

- প্রোগ্রামে না খেয়ে ধীরে ধীরে ছোট ছোট কামড়ে খাবার চিবিয়ে খেতে হবে।
- অধিক ক্ষুধার্ত না হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা না করে সময়মতো খাবার খেয়ে নিন।
- উচ্চ আঁশযুক্ত খাবার পছন্দ করতে হবে যাতে অল্প খেয়েও পেট ভরে যায়।
- অলসতা, একাকীত্ব, হতাশা, বিরক্তি দু:খবোধ ক্লান্তি ইত্যাদিও খাবারের চাহিদা বেড়ে যায়।
- ক্ষুধার্ত অবস্থায় কেনাকাটা করতে যাবেন না।
- সারাদিনে অন্তত ৩০ মিনিট ব্যায়াম করবেন।

আখতারুন নাহার আলো
লেখক। প্রধান পুষ্টি কর্মকর্তা, বারডেম

স্বা স্থ্য খ ব র

ফুসফুসের যত্ন

একজন পূর্ণবয়স্ক মানুষ প্রতি মিনিটে শ্বাস-প্রশ্বাস নেয় ১২-১৮ বার। আর একজন শিশুর প্রয়োজন হয় ২০-৩০ বার। তবে শারীরিক ও মানসিক অবস্থার সঙ্গে সঙ্গে শ্বাস-প্রশ্বাস নেওয়ার পরিমাণ বাড়তে বা কমতে পারে। প্রশ্বাসের সময় বিভিন্ন রকমের ক্ষতিকর গ্যাস আমাদের দেহের ভেতরে যেতে পারে, যা শরীরের জন্য হুমকিস্বরূপ। তাই দূষিত পরিবেশ যত পরিহার করা যায়, ততই ভালো।

পুরুষের ফুসফুসের ওজন নারীর ফুসফুসের তুলনায় বেশি হয়। আমাদের শরীরে হৃদপিণ্ড ও ফুসফুসের অবস্থান পাশাপাশি। আর এগুলোর কার্যক্রমও পরস্পরের ওপর নির্ভরশীল। তাই হৃৎপিণ্ডকে ভালো রাখার জন্য ফুসফুসের সুষ্ঠভাবে কাজ করাটা ভীষণ জরুরি।

ফুসফুসের কাজ

- পুরো দেহে বায়ু পাঠায়। অর্থাৎ পুরো শরীরে অক্সিজেন পৌছায়।
- ফুসফুস মস্তিষ্কে অক্সিজেন পাঠাতে পরোক্ষ ভূমিকা রাখে।

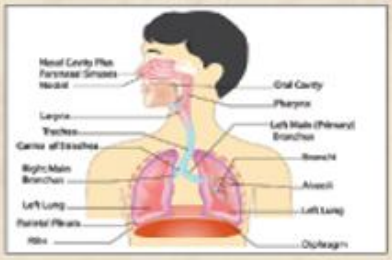

ফুসফুস ভালো রাখার জন্য করণীয়

- শুধু ফুসফুস নয়, পুরো দেহের জন্য যেকোনো মাদকদ্রব্য ও ধূমপান ভীষণ ক্ষতিকর। তাই সব বয়সের মানুষের জন্য ধূমপান ও মাদক বর্জনীয়। ধূমপায়ীদের ফুসফুসে 'নিকোটিন' (সিগারেটের ক্ষতিকর উপাদান) নামের ক্ষতিকর একটি উপাদান জমে যায়। বছরের বর বছর এ উপাদান জমে ফুসফুসে। ফলে ফুসফুস বিশুদ্ধ বাতাস দেহে পাঠাতে পারে না। ধূমপায়ী ও মাদকসেবীদের ফুসফুসের অসুখ হয় খুব বেশি। তাই পরিহার করুন মাদক ও ধূমপান।
- যেখানে ও যখন সম্ভব হয়, গাছ লাগান, সুযোগ পেলেই বুক ভরে নিঃশ্বাস নিন। সবুজ গাছপালার বাতাসে থাকলে দূষণমুক্ত অক্সিজেন পাওয়া সম্ভব।
- বাসা কলকারখানা, ইটভাটা, ট্যানারি থেকে দূরে হওয়া দরকার। নিয়মিত ঘরবাড়ি পরিস্কার করুন। বাসার মধ্যে পর্যাপ্ত আলো-বাতাস থাকাটা ভীষণ জরুরি। এতে রোগ-জীবাণু ও দূর হবে।
- রান্নাঘর, টয়লেট বা গোয়ালঘর থেকে গ্যাস বের হওয়ার পর্যাপ্ত ব্যবস্থা থাকতে হবে।

- বাড়ি ঘর থেকে শুমোট অবস্থা দূর করতে হবে। হাঁপানি ও যক্ষায় আক্রান্ত রোগীরা স্যাঁতসেঁতে পরিবেশে থাকবেন না।
- মাঝে মাঝে লিফটের পরিবর্তে সিঁড়ি দিয়ে হেঁটে উঠুন। এতে পুরো দেহে রক্ত সঞ্চালিত হবে, হৃৎপিণ্ডের সঙ্গে ফুসফুসেরও কার্যক্ষমতা বাড়বে। তবে আগে হার্ট অ্যাটাক বা ব্রেইন স্ট্রোকের ঘটনা ঘটেছে এমন ব্যক্তিরা সিঁড়ি দিয়ে ওঠা থেকে বিরত থাকুন। চিকিৎসকের পরামর্শ ছাড়া সিঁড়ি দিয়ে উঠবেন না।
- যক্ষা, হাঁপানি বা ফুসফুসের অন্য কোনো সমস্যা থাকলে নিয়মিত চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী পদক্ষেপ নিন।
- অবশ্যই উচ্চ রক্তচাপ, ডায়াবেটিস ও ওজন নিয়ন্ত্রণে রাখান। পারিবারিকভাবে ফুসফুসের ক্যান্সারের ইতিহাস থাকলে আগে থেকেই সতর্ক হোন।●

স্বা স্থ্য খ ব র

মোবাইলে টিউমার, পারকিনসন্স!

জীবনের অবিচ্ছেদ্য অংশ হয়ে গেছে এখন মুঠোফোন। তবে এই ফোনই আবার হয়ে উঠেছে ঝুঁকির কারণ। বিভিন্ন গবেষণায় অনেক আগেই উঠে এসেছে মোবাইল ফোনের অতি ব্যবহারে ক্যান্সারের ঝুঁকিতে পড়ে মানুষ। নতুন একটি গবেষণায় বলা হচ্ছে, মোবাইল ফোনের অতিরিক্ত ব্যবহারে মাথাব্যথা, ত্বকের জ্বালাপোড়া, টিউমার, ক্যান্সার, এমনকি পারকিনসন্সও হতে পারে। যুক্তরাষ্ট্রের ইন্ডিয়ানা ইউনিভার্সিটি, ফিনল্যান্ডের ইস্টার্ন ইউনিভার্সিটি এবং ব্রাজিলের ক্যাম্পিনাস ইউনিভার্সিটির এই গবেষণা ইলেকট্রোম্যাগনেটিক বায়োলজি অ্যান্ড মেডিসিন সাময়িকীতে এ তথ্য প্রকাশিত হয়েছে।

এ নিয়ে ইউক্রেনের ন্যাশনাল একাডেমির বিজ্ঞানী ড. ইগর ইয়াকিমেঙ্কো বলেন, 'পাঁচ বছরে প্রতিদিন গড়ে ২০ মিনিট মোবইল ফোনে কথা বললে সেই শঙ্কা তিন থেকে পাঁচগুণ বেশি। এই টিউমার থেকেই একটা সময় হয় ক্যান্সার।' মোবাইল ব্যবহারে শিশুরা সবচেয়ে বেশি স্বাস্থ্য ঝুঁকিতে থাকেন বলেও উল্লেখ করেছেন তিনি।

এই গবেষণায় উঠে এসেছে মোবাইলের অতিরিক্ত ব্যবহারে ক্যান্সার আর টিউমার হতে পারে মাথা ব্যথা, ত্বকের জ্বালাপোড়া এমনকি পারকিনসন্সও। অতএব মোবাইল ব্যবহারে সাবধান্।●

আদিকাল থেকেই মানুষ অসুখে-বিসুখে প্রাকৃতিক উপাদান বিশেষভাবে ভেষজ পদার্থ ব্যবহার করে আসছে। সময়ের বিবর্তনের সাথে সাথে এসব ভেষজ উদ্ভিদের অনেকগুলোই লোকজ বা আঞ্চলিকভাবে (folkloric reputation) স্বীকৃতি পেয়েছে। উন্নত বিশ্বেও ভেষজ উদ্ভিদের চিকিৎসা ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পাচ্ছে। বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থা তাই দেশীয় চিকিৎসা পদ্ধতিগুলোকে স্বীকৃতি দিয়েছে। নীরব ঘাতক স্বভাবের যে রোগটি মানবদেহে অসংখ্য ব্যধির উৎস, সেই ডায়াবেটিসের অব্যাহত অভিযাত্রায় বিশ্ববাসী আজ শঙ্কিত। সেজন্য এ্যালোপ্যাথিক ঔষধের পাশাপাশি ভেষজ চিকিৎসা ব্যবস্থা ডায়াবেটিস নিয়ন্ত্রণে কতটুকু গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে অথবা আদৌ কোন উপকার করে কিনা তা জানা প্রয়োজন। আমরা এ সংখ্যা থেকে দু'টি করে ভেষজ উদ্ভিদের সুপ্ত গুণাবলী নিয়ে আলোকপাত করবো। আশা করা যায় এটি ডায়াবেটিস চিকিৎসার ক্ষেত্রে অবদান রাখবে।

লাউনা আশ্বঢ়

প্রচলিত নাম: লাউনা আশ্বঢ়
বৈজ্ঞানিক নাম: *Pterospermum semisaggittatum Ham (unresolued)*
ইংরেজি নাম: Indian black berry
পরিবার (গোত্র): Thymelaceae
ব্যবহার্য অংশ: পাতা এবং বাকল
ব্যবহার পদ্ধতি: পাতা এবং বাকল শুকিয়ে গুঁড়া করে খাবারের সাথে অথবা পানিতে মিশিয়ে খাবারের আগে খেতে হবে। গবেষণায় দেখা গেছে যে, লাউনা আশ্বঢ় অগ্ন্যাশয়ের বিটা কোষের ইন্সুলিন নিঃসরণে সহায়তা করে। তাছাড়া রক্তের শর্করা শোষণও বিলম্বিত করে। ধরন-১ এবং ধরন-২ উভয় ধরনের ডায়াবেটিক রোগীরা খেলে উপকৃত হতে পারেন।●

বনধনিয়া

প্রচলিত নাম: বনধনিয়া
বৈজ্ঞানিক নাম: *Scoparia dulcis L.*
ইংরেজি নাম: Scoparia sweet broom, Bitter broom, Broom weed, licorice weed
পরিবার (গোত্র): Scrophulariaceae
ব্যবহার্য অংশ: সম্পূর্ণ গাছ
ব্যবহার পদ্ধতি: সম্পূর্ণ গাছ রোদে শুকাতে হবে, অতঃপর গুঁড়া করে পানিতে মিশিয়ে খাবারের আগে বা সাথে খেতে হবে। এই সম্পূর্ণ গাছের গুঁড়া শক্তিশালী এ্যান্টি-অক্সিড্যান্ট হিসাবে কাজ করে শরীর থেকে ফ্রি-র‍্যাডিক্যাল সমুহকে ধ্বংস করে। সেজন্য ধরন-১ এবং ধরন-২ ডায়াবেটিক রোগীরা খেলে উপকৃত হতে পারেন।●

প্রথম পৃষ্ঠার পর: ডায়াবেটিস ও চোখের ছানি

অনেকের চোখে আবার স্নোফ্লেক-এর পরিবর্তে সূক্ষ্ম সুঁচের মতো ঘোলা দাগ দেখা যায় । এই দুই ধরনের ছানিকে বলা হয় মূল ডায়াবেটিক ছানি (True diabetic cataract)। মূল ডায়াবেটিক ছানি সাধারণত জুভেনাইল ডায়াবেটিক, যাদের রক্তের শর্করা খুবই উঁচু মাত্রায় থাকে এবং অনিয়ন্ত্রিত বিপাক প্রক্রিয়া বিদ্যমান, তাদের বেলাতেই বেশি দেখা যায়। এ কারণে উন্নত দেশের তুলনায় আমাদের দেশসহ উন্নয়নশীল দেশে মূলত ডায়াবেটিক ছানি বেশি দেখা যায়। প্রাথমিক অবস্থায় এই ছানি ধরা পড়লে এবং ডায়াবেটিস সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ করলে ঘোলা লেন্সের দাগ আবার পরিষ্কার হয়ে যেতে পারে, অর্থাৎ এই ছানিকে প্রাথমিক অবস্থায় চিকিৎসা করালে আগের অবস্থায় ফেরানো সম্ভব।

রক্তে শর্করা বেশি মাত্রায় থাকলে লেন্সে সরবিটল জমা হতে থাকে। অ্যালডোজ রিডাকটেজ নামক একটি এনজাইম এই প্রক্রিয়াকে ত্বরান্বিত করে। এ অবস্থায় কোনো কোনো ক্ষেত্রে কয়েকদিনের মধ্যে ছানি পড়ে যেতে পারে। অ্যালডোজ রিডাকটেজ-এর এই ভূমিকার কথা বিবেচনা করে চিকিৎসা বিজ্ঞানীগণ ছানি প্রতিরোধ করার উপায় হিসাবে ঐ এনজাইমের সংবাধক (inhibitor) ব্যবহার করেছেন। যদিও আজ পর্যন্ত ছানি প্রতিরোধক কোনো এনজাইম বা ওষুধ আবিষ্কৃত হয়নি।

ছানির চিকিৎসা

ছানি পড়ার প্রাথমিক অবস্থায় চশমার সাহায্যে দৃষ্টির প্রখরতা বাড়ানো গেলেও আস্তে আস্তে রোগী যখন তার স্বাভাবিক কাজকর্মে অসুবিধা অনুভব করেন, তখনই ছানির একমাত্র চিকিৎসা অপারেশন করতে হবে। আমাদের দেশে একটা ভ্রান্ত ধারণা আছে যে, রোগীর ছানি সম্পূর্ণ না পাকলে তা অপারেশনের যোগ্য হয় না। এ ধারণাটি একেবারেই ঠিক নয়। বরং বেশি পেকে গেলেই চোখে অনেক জটিলতার সৃষ্টি হতে পারে এবং পরে অপারেশন করেও আশানুরূপ দৃষ্টি নাও ফিরে আসতে পারে।

ডায়াবেটিক রোগীদের ছানি অপারেশনের হার নন-ডায়াবেটিকদের তুলনায় ৪ থেকে ৬ গুণ বেশি। এসব রোগীর দৃষ্টি রেটিনোপ্যাথির কারণে কমে না গেলে, অপারেশনের ফলাফল নন-ডায়াবেটিক রোগীর সমান সমান। ডায়াবেটিস নিয়ন্ত্রণে থাকলে এ অপারেশনে অতিরিক্ত কোনো ঝুঁকি নেই, তবে ডায়াবেটিস রোগের কারণে এদের অপারেশনের ক্ষত শুকাতে একটু বেশি সময় লাগতে পারে। অনেকের বেলায় অপারেশনের পর তুলনামূলকভাবে ডায়াবেটিক রেটিনোপ্যাথি, আইরিস এবং রেটিনার নতুন রক্তনালী এবং ম্যাকুলার ইডিমা ইত্যাদির হার সামান্য বেশি হয়। তবে বর্তমানে আধুনিক ছানির অপারেশনে লেন্সের পেছনের আবরণী রেখে দেয়া হয় বলে এই হার অনেকাংশে কমে গেছে। একটি রিপোর্টে দেখা যায়, ডায়াবেটিক রোগীদের ছানি অপারেশনের পরে ৯০-৯৫ শতাংশ রোগীই কার্যকরী দৃষ্টিক্ষমতা ফিরে পেয়েছেন।

ছানির অপারেশন

১। ফ্যাকো সার্জারি

ছানির আধুনিক চিকিৎসা হচ্ছে ফ্যাকো সার্জারি। চোখের পাশে মাত্র ২ থেকে ৩ মিলিমিটার ছিদ্র করে এই অপারেশন করা হয়। লেন্সের ওপরের আবরণে গোল করে কেটে এর মধ্যেই ফ্যাকো মেশিনের সাহায্যে আলট্রাসনিক পাওয়ার দিয়ে লেন্সটিকে টুকরো টুকরো করে গলানো হয়। এভাবে লেন্সটি সম্পূর্ণ পরিষ্কার হয়ে গেলে এই আবরণের মধ্যেই একটি কৃত্রিম লেন্স বসানো হয়।

ফোল্ডঅ্যাবল লেন্স বা ভাঁজ করা যায়, এমন লেন্স ব্যবহার করলে ঐ ছিদ্র দিয়েই লেন্স ভাঁজ করে প্রবেশ করানো হয়। চোখের ভেতরে এই লেন্সটি সুন্দরভাবে সেট হয়ে যায়। ফোল্ডঅ্যাবল লেন্স ব্যবহার না করলে ঐ ছিদ্রটিকে ৫-৬ মি.মি বড় করে ঐ মাপের পিএমএমএ বা হার্ড লেন্স প্রবেশ করানো হয়। ২ পদ্ধতিতেই সেলাইয়ের প্রয়োজন হয় না। অভিজ্ঞ ফ্যাকো সার্জনগণ কোনো ইনজেকশন ছাড়াই শুধুমাত্র ওষুধের ফোঁটা দিয়ে চোখের ওপরটা অবশ করে এই অপারেশন করে থাকেন।

২। এসআইসিএস

লেন্স বেশি ম্যাচিওর হয়ে গেলে অনেক সময় মেশিনের সাহায্যে লেন্স গলানো কঠিন ও ঝুঁকিপূর্ণ হয়। এসব ক্ষেত্রে এসআইসিএস বা স্মল ইনসিশন ক্যাটারাক্ট সার্জারি খুবই উপযোগী। এ পদ্ধতিতেও ফ্যাকো পদ্ধতির মত লেন্সের আবরণীর ওপরের অংশ গোল করে কেটে এর ভেতর থেকে লেন্সের শক্ত অংশটি বা নিউক্লিয়াসটিকে পানি, জেল বা ভেকটিস যন্ত্রের সাহায্যে বের করা হয়। পরে লেন্সের নরম অংশ পরিষ্কার করে সাধারণত হার্ড লেন্স চোখে দেয়া হয়।

এ অপারেশনে লেন্সের ম্যাচুরিটি অনুযায়ী ৫-৭ মি.মি পরিমাণ ইনসিশন দেয়ার প্রয়োজন হয়। এই অপারেশনেও সাধারণত সেলাইয়ের প্রয়োজন হয় না। অভিজ্ঞ সার্জনের হাতে এ অপারেশনের ফলাফলও খুব ভাল।

৩। ইসিসিই

তুলনামূলকভাবে পুরনো ছানি অপারেশন। এ অপারেশনে ৯-১১ মি.মি ইনসিশন দিয়ে লেন্সটি বের করা হয় এবং তা পরিষ্কার করে কৃত্রিম লেন্স বসানো হয়। এ অপারেশনে ৬ থেকে ১০টি সেলাইয়ের প্রয়োজন হয়। সঠিকভাবে অপারেশন করা গেলে এই পদ্ধতিতেও রোগী ভাল দেখবেন। ●

অধ্যাপক এম. নজরুল ইসলাম
সহযোগী অধ্যাপক, চু বিভাগ, বারডেম হাসপাতাল, ঢাকা

বিড়ালের গলায় ঘন্টা বাঁধবে কে

ডা. জহুরুল আলম খান

এ ধরনের শিরোনাম দেখে অনেকেই চমকে উঠতে পারেন। ভাবতে পারেন, ডাক্তার সাহেব পাগল, না পাগলের ডাক্তার। আসলে আমি একজন হৃদরোগ বিশেষজ্ঞ হলেও, আজ আলোচনা করবো এমন একটি বিষয় নিয়ে যা এদেশে একটি নিয়মিত ঘটনা।

উন্নত দেশের মতো আমাদের দেশে বাতজ্বর কোনো বিরল অসুখ নয়। এ অসুখের কারণে হৃদপিন্ডের কপাটিকা (Valve) ক্ষতিগ্রস্ত হয়। পরিণামে রোগীর শ্বাসকষ্ট, বুক ধড়পড়ানি ও কাশি হয়। এবং কাশির সঙ্গে রক্তও দেখা যেতে পারে। ঠিকমতো চিকিৎসা না পেলে রোগী অকালে প্রাণ হারায়, অথবা কষ্ট করে বেঁচে থাকে। এমন একটি গুরুত্বপূর্ণ রোগ সম্বন্ধে এ দেশের জনগণ বেশ অজ্ঞ। এমনকি ডাক্তার সমাজের মধ্যেও একটা ভুল ধারণা আছে। কোনো কোনো সময় রোগীরা অবহেলিত হন, আবার কোনো কোনো সময় তাদেরকে 'ওভার ডায়াগনসিস' (অতিমাত্রায় রোগ নিরূপণ) করা হয়। এর কোনোটাই অভিপ্রেত নয়।

আজকে যে ব্যাপারে আলোকপাত করবো তা হলো: ডাক্তাররা কীভাবে 'ওভার ডায়াগনসিস' (রোগ অতিমাত্রায় নিরূপণ) করেন। আমাদের দেশের ডাক্তারদের মধ্যে একটা সাধারণ প্রবণতা হলো– রোগীর গিরায় অনেকদিনের ব্যথা ভালো হচ্ছে না, কাজেই ASO Titre পরীক্ষা করো। দেখা গেলো, ASO Titre স্বাভাবিক মাত্রার চেয়ে বেশি (২০০), ডাক্তার তখন বললেন, বাতজ্বর হয়েছে। যথারীতি ওষুধ শুরু হলো। ১ মাস বা ২১ দিন পর পর ১টা করে পেনিসিলিন ইনজেকশন চললো, যা খুবই বেদনাদায়ক। কিংবা ১টা করে বড়ি দিনে ২বার ৫ বছর বা তারও অধিক সময় ধরে চললো। এই যে একবার ওষুধ শুরু হলো- কোনো ডাক্তার

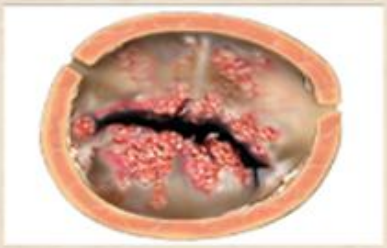

আর খতিয়ে দেখেন না, আসলেই রোগীর বাতজ্বর হয়েছিলো কিনা। রোগী এবং রোগীর অভিভাবক গভীর উৎকণ্ঠার সঙ্গে দিন কাটান এবং ওষুধ ব্যবহার করে যান। দেখা গেছে, বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই রোগীর বাতজ্বর নিরূপণ সঠিক হয়নি।

এটা ঠিক, এ রোগ নির্ণয়ের ব্যাপারে নিশ্চিত কোনো পরীক্ষা (Laboratory test) বা উপসর্গ (Sign & Symptom) নেই। এ ব্যাপারে ১৯৪৪ সালে T. Duckett Jones নামে একজন বিজ্ঞানী এগিয়ে আসেন এবং তিনিই প্রথমে এ রোগ নিরূপণের জন্যে কিছু মানদণ্ড (Criteria) ঠিক করে দেন, যার নাম Jones Criteria (জোনসের মানদণ্ড)। পরবর্তী সময়ে ১৯৯২ সালে AHA (American Heart Association) এর কিছু সংশোধন ও পরিবর্ধন করে- যার নাম Modified Jones Criteria বা পরিবর্ধিত জোনসের মানদণ্ড। এতে কিছু মুখ্য (Major) এবং কিছু গৌণ (Minor) মাপকাঠি আছে।

মুখ্য মাপকাঠি (Major Criteria)

১। Flitting Polyarthritis (গিরাসমূহের প্রদাহ, যা এক গিরা ভালো হয় তো আরেক গিরায় শুরু হয়)

২। Carditis (হৃদপিন্ডের প্রদাহ- যার ফলে বুকে ব্যথা, শ্বাসকষ্ট, পরিণামে Valve (কপাটিকা) নষ্ট হতে পারে।

৩। Chorea (এক ধরনের অস্বাভাবিক আচরণ ও অঙ্গভঙ্গি)

৪। Erythema Marginatum (ত্বকের অর্ধ চন্দ্রাকার ক্ষত)

৫। Subcutaneous Nodule (ত্বকের নিচে গোলাকার পিণ্ড)

গৌণ মাপকাঠি (Minor Criteria)

১। Arthralgia (গিরা ব্যথা)

২। Fever (জ্বর)

৩। Raised ESR or CRP

৪। Prolonged PR interval in ECG

বাতজ্বর বলতে হলে Major Criteria (মুখ্য মাপকাঠি) দুটো অথবা গৌণ মাপকাঠি (Minor Criteria) দুটো এবং মুখ্য মাপকাঠি একটা থাকতে হবে। এর সাথে সাম্প্রতিক Streptococcal ইনফেকশনের প্রমাণ থাকতে হবে (উচ্চ ASO Titre বা Culture-এ Streptococcus-এর প্রমাণ)।

ওপরের উল্লেখ অনুযায়ী মুখ্য ও গৌণ মাপকাঠি না থাকলে শুধু মাত্রাতিরিক্ত ASO Titre বাতজ্বরের জন্যে যথেষ্ট নয়। কোনো কারণে শরীরে Streptococcal ইনফেকশন হলে ASO Titre বাড়তে পারে। কাজেই উচ্চ ASO Titre এবং অনেকদিনের গিরা ব্যথাকে বাতজ্বর আখ্যায়িত করার প্রবণতা থেকে আমাদের বিরত থাকতে হবে। বাতজ্বর নির্ণয়ের ব্যাপারে যদি আমরা Modified Jones Criteria অনুসরণ করি, তাহলে রোগ নিরূপণে ভুল অনেক কম হবে। এর ফলে রোগী বা রোগীর অভিভাবকেরা টেনশন ও আর্থিক ক্ষতি থেকে রক্ষা পাবেন।

তাই, বাতজ্বর চিকিৎসার আগে অভিজ্ঞ কার্ডিওলজিস্ট বা মেডিসিন বিশেষজ্ঞের পরামর্শ নেয়া উচিত। তা না হলে ভুলক্রমে একবার বাতজ্বরের প্রতিরোধমূলক এন্টিবায়োটিক শুরু হলে কেউ আর তা সহজে বন্ধ করতে চাইবেন না। ওষুধ চলতেই থাকবে।

কাজেই, রোগ নির্ণয়ের ব্যাপারে সঠিক পদ্ধতি অনুসরণ করা উচিত এবং ভুল ডায়াগনসিস হলে তা সংশোধন করে সঠিক ওষুধ প্রেসক্রাইব করা উচিত। কিন্তু, বিড়ালের গলায় ঘন্টা বাঁধবে কে?

ডা. জহুরুল আলম খান
সহকারী অধ্যাপক, কার্ডিওলজি বিভাগ, বারডেম

প্রধান সম্পাদক: অধ্যাপক একে আজাদ খান, উপদেষ্টা সম্পাদক: মোহাম্মদ সাইফ উদ্দিন
সম্পাদক: ফরিদ কবির, নির্বাহী সম্পাদক: শহিদুল আলম, সহকারী সম্পাদক: মীর সারওয়ার আলম
বাংলাদেশ ডায়াবেটিক সমিতি কর্তৃক আরভিটিসি প্রিন্টিং প্রেস জুরাইন ঢাকা থেকে প্রকাশিত।